লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৬, চৈত্র ১৪০২

ভূমি আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ*

১.০ ভূমিকা

১.১ ভূমি ব্যবস্থাপনার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার দেওয়ানী লাভের পূর্বে এ উপমহাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার তেমন কোন বিধিবদ্ধ নীতিমালা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সুবিধেমত শাসনকর্তারা ভূমি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অবলম্বন করতো।

১.২ উপমহাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন হিন্দু শাসন আমল, মুসলিম শাসন আমল এবং ব্রিটিশ শাসন আমল।

১.৩ পরিশেষে পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ আমলে ভূমিব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

২.০ হিন্দু শাসন আমল

২.১ হিন্দু শাসন আমলে ভূমির মালিকানা বা উৎপাদিত ফসলের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনটি পক্ষকে দেখা যায়। রাজা, গ্রামীণ সমাজ এবং চাষী। হিন্দু শাসনামলে কৃষি কাজ বা চাষাবাদই ছিল সমাজের প্রধান কর্ম বা পেশা। চাষাবাদের ওপর তাদের জীবিকা, জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। চাষী উৎপাদিত ফসলের একটি বড় অংশ পেত। সমাজের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা Headman বা গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত গ্রাম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। গ্রাম সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের বিনিময়ে ভূমির উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ লাভ করতো।

২.২ অনুরূপভাবে রাজা রাজ্যের সর্বময়কর্তা হিসেবে প্রজা বা চাষীদের জানমালের হেফাজতকারী হিসেবে ভূমির উৎপাদিত ফসলের এক অংশ পেতেন। মনুসংহিতা বা মনুরবিধানে ভূমির একচ্ছত্র বা চূড়ান্ত মালিকানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট বা পরিষ্কারভাবে কিছু লিপিবদ্ধ নেই। তবে রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি বা কর্তা হিসেবে 'ভূমির মালিক রাজা' মর্মে যুক্তি দেখানো হয়েছে। অপরদিকে চাষীর স্বত্বাধিকারের বিষয়ে মুনি-ঋষিগণের মত এ রূপ-"চাষোপযোগী বা কৃষিভূমির মালিক সেই, যে উহার জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করছে"।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩.০ মুসলিম শাসন আমল

মুসলিম শাসনামলে ভারত বিজয়ের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা মতবাদ থাকলেও হিন্দু শাসনামলের অনেক নীতি ও পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলিম মতবাদ অনুসারে চাষাবাদী জমি যে কৃষক বা চাষী প্রথম আবাদ করতো, সেই ভূমির মালিকানা লাভ করতো এবং এর বিনিময়ে চাষীকে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ বা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কর বা খাজনা প্রদান করতে হতো। তবে হিন্দু শাসনামলের ন্যায় ভূমির ওপর অধিকার রাজা বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকত।

৪.০ ব্রিটিশ শাসন আমল

৪.১ ১৭৫৭ সালে পলাশীতে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার ইংরেজের নিকট পরাজয়ের মাধ্যমে এ দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক বিপর্যয় ঘটে। সকল ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। তখন সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব।

৪.২ ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পর বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরেজদের ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন ধারণা/জ্ঞান ছিল না। তদুপরি ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে তখনো কোন লিখিত নিয়ম ও পদ্ধতি ছিলনা। প্রথম দিকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু ও মুসলিম শাসন আমলের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল এবং দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেশীয় কর্মচারিদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের ভূমি ব্যবস্থাপনার অনভিজ্ঞতার সুযোগে এ দেশের নায়েবগণ কারচুপি ও তহবিল তসরূপ করে। অন্যদিকে ১৭৬৯-১৭৭০ইং/১১৭৬ বাংলা সনে এ দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত। দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। এ সময় ভূমি রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রয়্যালটি দিতে অসুবিধায় পড়ে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৯ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানকে অপসারণ করে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা তদারক করার জন্য প্রত্যেক পরগনার জন্য একজন ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও এ সকল পরগনায় রাজস্ব আদায়ের কোন উন্নতি সাধিত হয়নি।

৪.৩ ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সনে প্রথম গভর্ণর (পরে ১৭৭৩ সনে গভর্ণর জেনারেল) নিযুক্ত হয়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেক্টর নিয়োগ করে ভূমি রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজের হাতে নেয় এবং জমির খাজনা বৃদ্ধির জন্য ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর অনুকূলে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করে, যা পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এ সময় জমিদারগণ খাজনা বৃদ্ধিতে আপত্তি জানালে ভূমির খাজনা আদায় নিশ্চিত করার জন্য

কালেক্টরের কাজ তদারক করার নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট 'রেভিনিউ কাউন্সিল' গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের অধীনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'কমিটি অব সার্কিট' গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন জেলায় ভূমি রাজস্ব আদায় তদারক করতো।

৪.৪ জমিদারবৃন্দ কর্তৃক অত্যাচার করে খাজনা আদায় ও কোম্পানীকে সম্পূর্ণ খাজনা প্রদানে গড়িমসির কারণে কোম্পানী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ৫ বছর মেয়াদী বন্দোবস্তের মেয়াদকাল সমাপ্ত হওয়ার পর ১৭৭৭ সালে এক বছর সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থাও কৃষক কিংবা প্রজাকে কৃষির উন্নতির দিকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়।

৪.৫ ব্রিটিশ সরকার এদেশে একটি স্থায়ী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশকে এ দেশে গভর্ণর জেনারেল করে পাঠানো হয়। এ দেশের অতীত ও তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায় সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহের পর লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯০-৯১ বর্ষে দশ বৎসর মেয়াদী দশ-শালা বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরস (Court of Directors) এর অনুমোদনক্রমে দশ-শালা বন্দোবস্তকে ১৭৯৩ সালের ২২শে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করা হয়।

৪.৬ ১৯৭৩ সালের ২২শে মার্চ ১নং রেগুলেশনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমির মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ উপমহাদেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। জমিদারগণকে জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতিসহ মালিকানা স্বত্ব দেয়া হয়। কৃষি সম্প্রসারণ বা কৃষি উন্নয়নের ফলে জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পেলেও জমিদারদের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে অঙ্গীকার করা হয়। রেভিনিউ আদালতের (Revenue Court) কার্যধারা বা কার্যবিধি ছিল অনিয়ম, সংক্ষিপ্ত ও একতরফা। এর ফলে ১৭৯৩ সালের ২ নং রেগুলেশনের দ্বারা রেভিনিউ কোর্ট অর্থাৎ কালেক্টর ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিলোপ সাধন করে ভূমি মালিক ও জনসাধারণের মধ্যেকার বিরোধ এবং ভূমি মালিক ও তার প্রজাদের মধ্যেকার বিরোধের নিস্পত্তির জন্য দেওয়ানী আদালত প্রবর্তন করা হয়।

৪.৭ বাদশাহী আমলে বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্তের ব্যবস্থা ছিল। যথা-আলতামাগা (চিরস্থায়ী রাজকীয় দান), আয়মা (সুপন্ডিত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নিষ্কর ভূমি দান), মাদাদমাশ (সেবামূলক কার্য সম্পাদনের শর্তে দান), নাজারত (মসজিদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনুদান), সাইয়ুরঘাল (ফকির দরবেশের জন্য দান), জায়গীর (সামরিক বা বেসামরিক কর্মকর্তাকে বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান) ইত্যাদির প্রচলন ছিল। বাদশাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ৩৭ নম্বর রেগুলেশনে এবং আবাদশাহী লাখেরাজ বিষয়ক আইনটি ১৭৯৩ সনের ১৯ নম্বর রেগুলেশনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়।

৪.৮ ভূমি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর সর্বশেষ ৩০শে চৈত্রের নির্ধারিত বার্ষিক খাজনা জমিদারগণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঐ দিন সূর্যাস্তের পর সংশ্লিষ্ট জমিদারী রাজস্ব বকেয়ার দায়ে নিলামে বিক্রি করার বিধান করা হয়েছিল। এ

আইন 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত। তাই জমিদারগণ যে কোন প্রকারে প্রজার নিকট থেকে খাজনা আদায় করে যথাসময়ে কোম্পানীর পাওনা পরিশোধ করে জমিদারী রক্ষার চেষ্টা করতো। ফলে প্রজাদের ওপর জমিদারের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য দিকে কোম্পানীর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল।

৪.৯ ১৮০০ সনের ৮ নং রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক কালেক্টরকে প্রত্যেকটি জমিদারীর ভূমির তফসিল, খাজনার বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিষ্টার খোলার আদেশ দেয়া হয়। এ রেজিষ্টারকে 'তৌজি রেজিষ্টার' এবং ক্রমিক নম্বরকে 'তৌজি নম্বর' বলে।

৪.১০ দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ায় কোম্পানীর অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে বাকি খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জমিদারের হাত শক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। পাশ হয় Regulation VII of 1799 যা-কুখ্যাত 'হপ্তম আইন' নামে অধিক পরিচিত। এই আইনে বাকি খাজনার জন্য আদালত বা রাজস্ব অফিসারের আদেশ ব্যতিরেকে রায়তকে গ্রেফতার এবং তার ক্ষেতের ফসল, হাল, হালের গরু ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার ক্ষমতা জমিদারকে দেয়া হয়। ফলে রায়ত হয়ে যায় প্রকৃতপক্ষে জমিদারের ভূমি দাস।

৪.১১ এ আইনের কুফল প্রতিভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর টনক নড়ে। পাশ হয় Bengal Land Revenue Sales Regulation, 1812. এতে রায়তকে গ্রেফতার করার অধিকার তুলে দেয়া হয় এবং সম্পত্তি ক্রোকের অধিকার খর্ব করা হয়। লাঙ্গল বা চাষের যন্ত্র এবং হালের গরু ক্রোক থেকে রেহাই পায়।

৪.১২ জমিদারগণ ভোগ বিলাসে এবং আরাম আয়েশে শহরে জীবন যাপন করতে থাকে। জমিদারীর রাজস্ব আদায় এর ব্যাপারে তেমন মনযোগী ছিল না। সূর্যাস্ত আইনের কারণে জমিদারী নিলাম হয়ে যাবে এই ভয়ে জমিদারীর অংশ বিশেষ পত্তনী প্রদান করা হত। জমিদারী করভারে জর্জরিত হয়ে পড়ার পর জমিদারী রক্ষার জন্য জমিদারীর অংশ বিশেষ পত্তনী দিয়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকারের পাওনা বা কর পরিশোধ করা হতো। মিঃ হ্যারিংটনের মতে নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে চিরস্থায়ীভাবে সৃষ্ট অধীনস্ত জোত বা জমাকে পত্তনী তালুক বুঝায়। ১৮১৯ সালের ৮নং রেগুলেশন এর মাধ্যমে পত্তনী তালুক সৃষ্টির বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৪.১৩ ০১-০৮-১৮২২ তারিখে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এর কাছে প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জমি জরিপ ও স্বত্বলিপি তৈরির প্রস্তাব করা হয়। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নীতিগতভাবে অনুমোদন করলেও এ বিষয়ে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। Indemnity Regulation 1822 পাশ করে খুদকাস্ত রায়ত ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর রায়তকে বাকী খাজনার দায়ে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা নিলামে ক্রেতা নব্য জমিদারকে দেয়া হয়।

৪.১৪ এ আইন বাতিল করে Land Revenue Sales Act 1841 পাশ হয়। এ আইনে নতুন জমিদারকে খুদকাস্ত রায়ত ব্যতীত অন্য রায়তের খাজনা বর্ধিত হারে স্থির করার

এবং অনাদায় বা অস্বীকৃতিতে তাদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৪৫ সালে নুতন Revenue Sales Act জারি হয়; কিন্তু জমিদারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়।

৪.১৫ নদীর সিকস্তি ও পয়স্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন কল্পে এবং চরের জমির মালিকানা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৮২৫ সনের বঙ্গীয় এ্যালুভিয়ন ও ডিলুভিয়ন রেগুলেশন প্রণীত হয়েছিল যা পরবর্তীতে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ও ৮৭ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পি ও ১৩৫/৭২, পি ও ১৩৭/৭২ এর মাধ্যমে তা আবার সংশোধন করা হয়। ১৯৯১ সনে তা বাতিলের জন্য অধ্যাদেশ জারি করার কিছুদিন পর বাতিল আদেশ আবার রহিত করা হয়।

৪.১৬ জমিদারী রক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদারগণ খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন বৃদ্ধি করে। ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ গণ-অসন্তোষ এবং এদেশ থেকে বিদেশী শাসকদের বিতাড়ণের স্পৃহা ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়; যা সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের গোচরে যায় এবং কোম্পানী থেকে শাসন ভার ইংল্যান্ডের রাণী নিজের হাতে নেয়। গণ-অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে ১৮৫৯ সালে রেন্ট এ্যাক্ট পাশ করে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। জমির নক্সা তৈরির জন্য ১৮৫৭ সালে সার্ভে আইন পাশ করা হয়। রেন্ট এ্যাক্টের বিধান বাস্তবায়নের অভাবে প্রজাদের মধ্যে গণ-অসন্তোষ থেকে যায়। তা নিরসন কল্পে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৮৭৯ সালে রেন্ট কমিশন গঠন করা হয়। প্রজার স্বার্থ রক্ষা, প্রজা, জমিদার ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি রচনা করার জন্য কমিশন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার সুপারিশ করেন। রেন্ট কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে লর্ড রিপন ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন পাশ করেন।

৪.১৭ ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক শাসন প্রদানের ফলে বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক ঋণ সালিসী আইন পাশ করায় বাংলার কৃষক সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পায়।

৪.১৮ ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাদের অধিকার ও স্বার্থ অনেকটা নিশ্চিত হলেও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষ থেকে যায়। বিভিন্ন সময়ে গণ-অসন্তোষ এর কারণে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন ৮ বার সংশোধন করা সত্ত্বেও জমিদারদের নির্যাতন বন্ধ করা যায়নি।

৪.১৯ ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়, যা ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত। ফ্লাউড কমিশন সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে নেয়ার সুপারিশ করে প্রতিবেদন পেশ করে। জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাওয়ায় তারা তার বিরোধিতা করে। প্রাদেশিক সরকার কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১৯৪৪ সালে প্রাদেশিক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটিও ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ সমর্থন করে রিপোর্ট দেয়।

৫.০ পাকিস্তান আমল

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৭ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করার জন্য বিল পেশ করে। দেশ বিভাগের ফলে এই বিল পাশে বিলম্ব হয় এবং ভারত বিভক্তির পর ১৯৫০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর এ বিল পাশ হয় এবং এটা আইনে পরিণত হয়। এটা ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন। এ আইন পাশের ফলে এদেশে জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ হয়। পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ জমি খাস দখলে রাখা যাবে না এ সম্পর্কে এ আইনে বিবৃত হয়েছে। পরে ১৯৭২ সালে পি ও ৯৮/৭২ মূলে সর্বোচ্চ পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি ধার্য করে দেয়া হয়েছে।

৬.০ বাংলাদেশ আমল

৬.১ ১৯৮২ সালের ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশ এবং ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং ক্ষেতমজুর (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী (ক) পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘার সিলিং নির্ধারণ করা হয়, তবে যে সব পরিবারে জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা বা কম তারা ৬০ বিঘার বেশি জমি সংরক্ষণ করতে পারবেন না; (খ) বর্গাচাষীরা ৫ বছরের জন্য জমি চাষের অধিকার পায়; (গ) বর্গা জমির ফসল তেভাগা ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় অর্থাৎ শ্রমের জন্য একভাগ, কৃষি উপকরণের জন্য একভাগ এবং মালিক একভাগ পাবেন; (ঘ) ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা হয় সাড়ে তিন কেজি চাল বা সমপরিমাণ অর্থ এবং (ঙ) সিলিং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন বা ১০ বিঘার কম জমির মালিক এমন কৃষক পরিবারের মাঝে বন্টন করার সিদ্ধান্ত হয়; তবে ১০ বিঘার বেশি জমি যাদের আছে তারা কেউ পাবেন না।

৬.২ ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ওপরে বর্ণিত আইন ছাড়াও আমাদের দেশে ভূমি সংক্রান্ত অনেক আইন/অধ্যাদেশ/বিধিমালা বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

ক) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন;
খ) ১৮৮২ সালের পথাধিকার আইন;
গ) ১৯৪৯ সালের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন;
১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন বিধিমালা;
ঘ) ১৯৩৫ সালের জরিপ ও ভূমি বন্দোবস্ত ম্যানুয়াল;
ঙ) ১৯৫৮ সালের জি ই ম্যানুয়েল;
চ) ১৯১৩ সালের পি ডি আর এ্যাক্ট;
ছ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ;
জ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর বিধিমালা এবং
ঞ) ১৯৮৭ সালের ভূমি উন্নয়ন কর সংশোধন অধ্যাদেশ।

৬.৩ ১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী আইন, ১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী বিধিমালা, ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ আইন ও ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। সরকার ১৯৯২

সালে-১৯৮৯ সালের ঋণ শালিসী আইন রহিত করেছেন এবং ১৯৯১ সালে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেছে। ১৯৯০ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ১৯৫৮ সালের জি ই ম্যানুয়েল বাতিল করা হয়েছে।

৬.৪ অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সময়ে যে, আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

i) East Pakistan Disturbed Person (Rehabilitation) Ordinance, 1964;
ii) East Pakistan Enemy Property (Land & Buildings) Administration and Disposal Order, 1966 and
iii) The Vested and non resident Property (Administration) Repeal) Ordinance, 1976.

৬.৫ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত আইন কানুন সমূহ নিম্নরূপ ঃ

i) Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) order, 1972 (P.O. 16/72) and
ii) Bangladesh Abandoned property (land, Building and any other property) Rules, 1972.

৬.৬ ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি হুকুম দখল সংক্রান্ত আইন/অধ্যাদেশ/বিধিমালা

ক) এল এ ম্যানুয়েল;
খ) ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৪;
গ) সম্পত্তি জরুরী হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮;
ঘ) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২;
ঙ) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২;
চ) স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল বিধিমালা, ১৯৮২;
ছ) সম্পত্তি জরুরী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৮৯।

৬.৭ ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করার জন্য ১৯৮০ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ড আইন এবং ১৯৮৫ সালে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের কার্যবিধিমালা প্রণীত হয়। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে দু' ভাগে বিভাজন করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ভূমি আপীল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ভূমি আপীল বোর্ড রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে থাকে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

৭.০ উপসংহার

গত আড়াইশ' বছরে ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা জনস্বার্থে আরও সহজিকরণের লক্ষ্যে অনেক কিছু করার অবকাশ আছে ।

বিঃদ্রঃ প্রবন্ধটি বিপিএটিসির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ চর্চা মডিউলের পাঠ্য বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত)- *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালী সমাজ সুবর্ণ প্রকাশনা ঢাকা।*

২। বদরুদ্দিন উমর-(১৯৭৪) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।*

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-(১৯৮৩) *ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন*- জানুয়ারি, ।

৪। মোঃ আবদুল কাদের মিয়া-(১৯৮৯) *ভূমি জরীপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, কাশবন মুদ্রায়ণ, ঢাকা।*

৫। ভূমি মন্ত্রণালয় (১৯৮৭) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল*-

৬। এ কে এম জাহাঙ্গীর- *মাঠ প্রশাসন।*

৭। মোঃ আবদুল কাদের মিয়া- *ম্যানুয়েল, কাশবন মুদ্রায়ন, ঢাকা।*